আমাদের সময়

তারিখ 21 FEB 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

হাসান-উজ-জামান

মাতৃভাষা আন্দোলনের ইতিহাস

অনেকের মনে, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের মনে প্রশ্নের অবতারণা হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, যিনি স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে জীবনের মায়া ত্যাগ করে আপামর জনগণকে জাতীয়তাবাদী চেতনার মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে মহান মুক্তিযুদ্ধকে সফল নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তিনি রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভে পাকিস্তান রাষ্ট্রের পাঞ্জাবি শাসকগোষ্ঠীর অগণতান্ত্রিক ও অনৈতিক পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তথা বাঙালির মাতৃভাষা সুরক্ষার আন্দোলনে কতটুকু ভূমিকা ও অবদান রেখেছিলেন? জীবনের অধিকাংশ সময় অর্থাৎ দীর্ঘ ১০-১১ বছর তিনি কারা ভোগ করেছিলেন। এমনকি বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন চলাকালীন কারারুদ্ধ থাকা সত্ত্বেও মাতৃভাষা আন্দোলনে অবিস্মরণীয় ভূমিকা ও অবদান রেখেছেন। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালির প্রতি আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক বৈষম্যের পাশাপাশি ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর প্রথম আঘাত হানা, যা পূর্ববঙ্গের অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা ক্রমেই উপলব্ধি করতে শুরু করে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের নামকরণের মধ্যেই এই চরম বৈষম্য লুকিয়ে ছিল। সাধারণ মানুষ এ বিষয়টি প্রথম দিকে তেমন উপলব্ধি না করলেও ক্রমান্বয়ে এই বাস্তবতা উপলব্ধি করতে শুরু করে। পাকিস্তানের পূর্ণ নামকরণ হয়েছিল ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN, অর্থাৎ পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্র। সুতরাং এ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ধর্মীয় ভিত্তির ওপর। ফলে এর শাসকগোষ্ঠী উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা প্রতিষ্ঠার গভীর চক্রান্তে নেমেছিল। এমনকি উর্দুকে সব বিদ্যালয় পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল।

পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পর ঢাকায় আয়োজিত এক সম্মেলনে গঠিত হয় গণতান্ত্রিক যুবলীগ। সম্মেলনে ভাষাবিষয়ক কিছু প্রস্তাব সিদ্ধান্ত আকারে গৃহীত হয়, যা পাঠ করেন তৎকালীন যুবনেতা শেখ মুজিবুর রহমান। ওই প্রস্তাবে তিনি উল্লেখ করেন– 'বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের লেখার বাহন এবং আইন আদালতের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হোক। সারা পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা কী হবে সে সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব জনগণের ওপর ছেড়ে দেওয়া হোক এবং জনগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গৃহীত হোক।' পাকিস্তানের সৃষ্টির পর এভাবেই সর্বপ্রথম মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার দাবি উচ্চারিত হয়েছিল। ভাষাসৈনিক গাজীউল হকের লেখা 'ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা' পুস্তকে এর বর্ণনা পাওয়া যায়।

১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান সৃষ্টির পর জিন্নাহ কর্তৃক তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তথা বাঙালিদের প্রতি আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বৈষম্য উপলব্ধি করে ওই বছরের (১৯৪৭) শুরুতে কলকাতার সিরাজউদ্দৌলা হোটেলে এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় যুবনেতা শেখ মুজিবসহ কতিপয় নেতা কর্তৃক অসম্প্রদায়িক ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। '৪৭-এর ডিসেম্বরে শেখ মুজিবসহ ১৪ জন ভাষাপ্রেমিক বাংলা ভাষা আন্দোলনসহ বিভিন্ন দাবিসংবলিত ২১ দফা ইশতেহার প্রণয়নে ভূমিকা রাখেন, যা পুস্তক আকারে প্রকাশ হয়ে নামকরণ হয়– 'রাষ্ট্রভাষা ২১ দফা ইস্তেহার-ঐতিহাসিক দালিল'। শেখ মুজিব তমদ্দুন মজলিশের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন এবং এর পক্ষে গণস্বাক্ষর গ্রহণ করেন, যা আগামী প্রকাশনী প্রকাশিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. মাযহারুল ইসলামের গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

তৎকালীন প্রগতিশীল ছাত্র-যুব আন্দোলনের অংশ হিসেবে ভাষা আন্দোলনে মোগলটুলীর ১৫০ নম্বর বাড়িটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। এখান থেকে মাতৃভাষাসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত প্রচার-প্রচারণা চালানো হতো। শেখ মুজিব, কমরুদ্দিন, জহিরুদ্দিন, নঈমুদ্দিন, শওকত আলী প্রমুখ ছিলেন এর সংগঠক। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের ১০ দফা দাবির মধ্যে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা আদায়ের জোরালো দাবি উত্থাপিত হয়, যার অন্যতম কুশীলব ছিলেন শেখ মুজিব।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, তৎকালীণ প্রকৌশল মহাবিদ্যাল এবং ঢাকা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ক্লাস বর্জন ও দলে দলে যোগদানের মধ্যে দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ধর্মঘটের মধ্যে ১৯৪৮-এর ২৬ ফেব্রুয়ারি অধ্যাপক আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম বাংলা ভাষার পক্ষে অনুষ্ঠিত এই সফল ধর্মঘট ও সমাবেশের ব্যবস্থাপনা এবং সফলতার কৃতিত্ব দেন তৎকালীন যুবনেতা শেখ মুজিবকে। শেখ মুজিবসহ প্রগতিবাদী ছাত্র ও যুবনেতৃবৃন্দ এ সমাবেশে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার এবং সর্বাত্মক সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। মুসলিম ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন মজলিশের

যৌথ সভায় ফজলুল হক মুসলিম ছাত্র হলে ১৯৪৮-এর ২ মার্চ অনুষ্ঠিত যৌথ সভায় নতুন করে রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। শেখ মুজিবসহ অন্যদের মধ্যে এ সভায় উপস্থিত ছিলেন সামছুল হক, আবুল কাশেম, রনেশ দাস গুপ্ত, অর্জিত গুহ, অলি আহাদ, মোহাম্মদ তোয়াহা। ক্ষমতাসীন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার ও তাদের দল মুসলিম লীগ কর্তৃক বাংলা ভাষাবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু হয়। তমদ্দুন মুজলিশ গণআজাদী লীগ, গণতান্ত্রিক যুবলীগ সমন্বয়ে সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এর চালিকাশক্তি ছিলেন শেখ মুজিব।

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আহ্বায়ক নঈমুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে ১৯৪৮-এর ১৭ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় শেখ মুজিবের অংশগ্রহণে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুসারে ওই দিন দেশব্যাপী সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মূলত ভাষার দাবিতে সফল ধর্মঘট পালিত হয়। দৃঢ়প্রত্যয়ী এবং আন্দোলনের প্রশ্নে অবিচল শেখ মুজিব ক্রমেই ছাত্র-যুব সমাজের মধ্যে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে জনপ্রিয় নেতা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। অন্য নেতাদের মধ্যে সক্রিয় ছিলেন সামছুল হক, তাজউদ্দীন আহমদ, নঈম উদ্দিন আহমদ, তোয়াহা, আব্দুল মতিন, শওকত আলী প্রমুখ।' রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগানে রাজপথ প্রকম্পিত হয়, সারা বাংলা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখায় ১৯৪৯-এ শেখ মুজিব দুবার কারারুদ্ধ হন। ভাষা আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখনো তিনি কারাগারে ছিলেন। শারীরিকভাবে তিনি অনুপস্থিত থাকলেও কারা অভ্যন্তরে থেকেও আন্দোলনকারীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিতেন ও দিকনির্দেশনা পাঠাতেন। বিশিষ্ট কলামনিস্ট আব্দুল গাফফার চৌধুরীর লেখা 'কিছু স্মৃতি কিছু কথা' প্রবন্ধে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, বায়ান্নর ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি শেখ মুজিবকে ঢাকা কারাগার থেকে ফরিদপুর কারাগারে স্থানান্তর করা হয় এবং ভাষাসংগ্রামীদের উদ্দেশে তিনি তখন উৎসাহ প্রদানের জন্য চিরকুট পাঠাতেন। ভাষাসৈনিক গাজীউল হকের ভাষ্যমতে, বায়ান্নর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কারারুদ্ধ থাকায় তার পক্ষে তখন প্রকাশ্যে বা শারীরিকভাবে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ সম্ভব হয়নি।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন চলাকালীন বাঙালিদের কাছে অন্যতম জনপ্রিয় নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বাংলা ভাষার বিপক্ষে বিবৃতি দিলে আন্দোলন কিছুটা বাধাগ্রস্ত হয়। মুক্তিলাভের পর শেখ মুজিব সোহরাওয়ার্দীকে তার মত পরিবর্তন করিয়ে বাংলা ভাষার পক্ষে নতুন করে বিবৃতি প্রদানে বাধ্য করেন, যা শেখ মুজিবের পক্ষেই সম্ভব ছিল বলে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী অভিমত ব্যক্ত করেন। বায়ান্নর ২৯ ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে এ বিবৃতি প্রকাশিত হয়। এ বিবৃতি ভাষাসংগ্রামীদের নতুন করে অনুপ্রাণিত করে। ১৯৫৩-এর একুশের প্রথম বার্ষিকী উদযাপনে শেখ মুজিব অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তার আহ্বানে আরমানীটোলায় অনুষ্ঠিত জনসভায় তিনি ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস এবং বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা ঘোষণার জোর দাবি জানান।

১৯৪৮-এর ২১ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্সের জনসভায় এবং ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে ছাত্র সমাবেশে পকিস্তানের বড় লাট মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সবাইকে হতবাক করে ঘোষণা দেন– "URDU AND URDU SHALL BE THE STATE LANGUAGE OF PAKISTAN" (উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা), যে বৈষম্যমূলক ও অনৈতিক ঘোষণা ছাত্রসমাজ প্রত্যাখ্যান করে এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়। প্রতিবাদকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তৎকালীন ছাত্রনেতা শেখ মুজিব। জিন্নাহর বৈষম্যমূলক এই ঘোষণাই পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে আঘাত হানে, অর্থাৎ পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতাই এই রাষ্ট্রের ভাঙনের মূলহোতা বা উদ্যোক্তা।

১৯৪৭-এ সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান রাষ্ট্রের সূচনা ঘটেছিল রাষ্ট্র ভাষার ক্ষেত্রে এর শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। নবগঠিত এই রাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৫ শতাংশের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও এর স্থলে সংখ্যালঘু মাত্র ৫ শতাংশের ভাষা উর্দুকে অযৌক্তিক ও অনৈতিকভাবে চাপিয়ে দেওয়ার ঘৃণ্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে বাঙালি ক্রমেই ঐক্যবদ্ধ হয়। মাত্র সাড়ে চার বছরের মাথায় বায়ান্নতে রক্তাক্ত আন্দোলনের সফল পরিসমাপ্তি ঘটে। রাষ্ট্রভাষা প্রতিষ্ঠার মহান আন্দোলনই বাঙালি জাতিকে জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ করে স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা তথা জাতির মুক্তি সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করে। বাঙালি জাতীয়তাবোধের স্বকীয়তা তথা স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত হয় এবং সফল পরিণতি লাভ করে মাতৃভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। বাঙালির কৃষ্টি, ঐতিহ্য, স্বকিয়তা ও স্বাতন্ত্র্যবোধের এ মনস্তাত্ত্বিক লড়াই স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাঙালিকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলে। যা মাতৃভাষা আন্দোলনের এবং পর্যায়ক্রমে চলমান প্রতিটি আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সুযোগ্য নেতৃত্বে ১৯৭১-এ সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামে অবর্ণনীয় আত্মত্যাগের বিনিময়ে মহান বিজয়ের সফল পরিসমাপ্তি এনে দেয়। আজ আমাদের মাতৃভাষা বাংলা আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আমরা জাতি হিসেবে গর্বিত।

লেখক : মহাসচিব, হিউম্যান রাইটস্ ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ